স্মরণাঞ্জলি

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পঁচাত্তর বছর

স্বামী বলভদ্রানন্দ
সহকারী সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠার তারিখ ১১ মে ১৯৫১। চুয়াত্তর বছর পূর্ণ করে পঁচাত্তর বছর পূর্তির দিকে এগিয়ে চলেছে এই শ্রীমন্দির। ''ধন্য কামারপুকুর। তুমি এ যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; ভগবানের পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া তুমি মহাপুণ্যভূমিতে পরিণত হইয়াছ।'' বহু মানুষের মনের কথা যথোপযুক্ত এই ভাবে ও ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিল উদ্বোধন পত্রিকা, তার ১৩৫৭-র অক্টোবর সংখ্যায়, কামারপুকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করতে গিয়ে।

হতভাগ্য দেরেগ্রাম। এই সৌভাগ্য তারই হতে পারত। দুর্দান্ত জমিদারের মিথ্যাচার এবং সত্যস্বরূপ ভগবানের 'পিতা'-র সত্য-দৃঢ় প্রতিরোধ—এই দুয়ে মিলে দেরেগ্রামের কপাললিখন বদলে দিল। সচ্ছল ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে সপরিবার দেরেগ্রাম ছাড়লেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন সমনস্ক বন্ধু কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী। নিজ সম্পত্তির এক অংশে চিরকালের জন্য আশ্রয় দিলেন ক্ষুদিরামকে।

অতঃপর কামারপুকুরেই বয়ে চলল ক্ষুদিরামের 'ধর্মের সংসার', ভগবানের অবতরণের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে।

এখানেই তিনি পেলেন 'রঘুবীর শিলা'—রাম-অবতারের পুনরাবির্ভাবের আগমনী। তারপর কত চিত্র পরপর। 'নারায়ণে'র অবতরণের আগেই ক্ষুদিরামের সহধর্মিণী চন্দ্রা দেবীকে দর্শন দিয়ে মা লক্ষ্মীর প্রতিশ্রুতি : আমি পরে আসব তোমার ঘরে। গয়াধামে ক্ষুদিরামকে ভগবানের নির্বাচন আশু অবতরণের আশ্রয়রূপে। শিবসম্ভূত জ্যোতিরূপে ভগবানের প্রবেশ চন্দ্রা দেবীর গর্ভে। বিভূতিবিভূষিত রূপে গদাধরের জন্ম ও মনোহর বাল্যলীলা। ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের কলকাতা আগমন। কিছু পরে গদাধরেরও কলকাতা আগমন ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে

নবনির্মিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে এসে স্থায়ীভাবে অবস্থান। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু ও তাঁর কালীমন্দিরের পূজারি হওয়া। সাধনভজনে ডুবে জগৎসংসার ভুলে যাওয়া, অথচ ভাবী সহধর্মিণীকে নিজেই চিহ্নিত করে দেওয়া। সম্ভবত তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, সহধর্মিণী আসছেন তাঁকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে, সংসারপথে টেনে নিয়ে যেতে নয়।

এরপর সাধনার পর সাধনা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। চোদ্দো বছর পরে সারদাকে ষোড়শী দেবীরূপে পূজার মাধ্যমে সাধনার পরিসমাপ্তি। এবার অর্জিত আধ্যাত্মিক সম্পদের বিতরণ পর্ব। প্রথমে বর্ষীয়ান ধর্মনেতাদের মধ্যে, পরে ধীরে ধীরে জগন্মাতার নির্দেশিত অপেক্ষাকৃত তরুণ ও তরুণতর ভক্তদের মধ্যে। ক্রমশ আগমন নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, শরৎ প্রমুখের। সঙ্ঘের অঙ্কুরোদ্গম দক্ষিণেশ্বরেই। নহবতে গড়ে উঠছেন সঙ্ঘজননী আর যুবক ভক্তদের মধ্য থেকে স্বতঃই প্রকাশিত হচ্ছেন সঙ্ঘনেতা। শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে সেই অঙ্কুর পুষ্টতর। মর্ত্যলীলা অবসানপ্রায়। সারদা দেবী ও নরেন্দ্রনাথকে আরব্ধকর্মের ভার দিয়ে ভগবানের এবারের নরলীলা স্থূলদেহে সমাপ্ত।

এরপর, বরানগরে প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ। বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও পাশ্চাত্যযাত্রা। ঝঞ্ঝাসদৃশ সন্ন্যাসী হয়ে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-আচরিত বেদান্তের প্রচার, ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ভারতকে জাগানো ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তারপর যোগ্য সন্ন্যাসী-ভাইদের মধ্যে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত ভাবগুলি প্রোথিত করে দিয়ে সপ্তর্ষির প্রধান ঋষির বিদায়। আর মা কী করলেন? অবশিষ্ট রত্ন-সন্তানদের নিয়ে, একাধারে রামকৃষ্ণ-সারদা হয়ে শিশুসঙ্ঘকে লালন ও পরিচালনা করে চললেন বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত পথে।

ফিরে আসি শিরোনামের প্রসঙ্গে। ঠাকুরের জন্মস্থানটি সংরক্ষণের প্রথম সুচিন্তিত পদক্ষেপ সঙ্ঘজননীরই। মাকে ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন কামারপুকুরেই চিরকাল থাকতে। বলেছিলেন, ‘‘বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট কোরো না।’’ ঠাকুরের নিজের আবাসগৃহকেই ঠাকুর এখানে মায়ের ‘নিজের ঘর’ বলে স্পষ্ট নির্দেশ করে দিয়েছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুরের এই কথাটি রাখতে। অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে মায়ের এই সময়কার দিনগুলি কাটত। শতচ্ছিন্ন বস্ত্র গিঁট দিয়ে দিয়ে পরতেন। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে শাক বুনতেন। লক্ষ্মীজলা থেকে পাওয়া ধান সেদ্ধ করে ভাতের ব্যবস্থা হয়তো হত, কিন্তু নুন জুটত না। তবুও মা চেষ্টা করেছিলেন কামারপুকুরেই থেকে যেতে। কিন্তু শ্বশুরালয়ের আত্মীয়বর্গের উদাসীনতা এবং গাঁয়ের লোকের দস্যিগিরির কথা শুনে দিদিমা শ্যামাসুন্দরী দেবী মাকে জয়রামবাটীতে নিয়ে চলে এসেছিলেন। মা নিজমুখেই বলেছেন সেকথা : ‘‘ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর কিছুদিন ঘুরে ফিরে যখন কামারপুকুরে গিয়ে থাকি, রামলালরা যেন উপেক্ষার ভাব দেখাতে থাকল। আর লাহাবাবুদের এই দানবগুলোর দস্যিগিরির কথা শুনে আমার মা আমাকে জয়রামবাটী নিয়ে এলেন। আমাকে আর কামারপুকুরে যেতে দিলেন না।’’

তবুও ঠাকুরের স্মৃতিপূত ঘরটির রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মায়ের নজর ছিল। তার সংরক্ষণের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাতেন। রঘুবীরের সেবার গুরুত্বও তিনি বুঝতেন ও তার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতেন। যখন কামারপুকুরে থাকতেন, একবার কয়েকদিনের জন্য মা জয়রামবাটী যান। ফিরে এসে দেখেন, রামলালদাদা নিজের ইচ্ছেমতো বাড়ির

ভাগ-বাঁটোয়ারা করে শ্রীরামকৃষ্ণের বাসকক্ষটি শুধু শ্রীমায়ের জন্য রেখে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেছেন। তবুও সেই রামলালের অংশের কক্ষটি দ্বিতল করার সব খরচ শ্রীশ্রীমা বহন করেছিলেন।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটার ওপরে একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ-কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিন ধরে ছিল। ১৯০২ সালে এই উদ্দেশ্যে একটি তহবিল তৈরি হয়, যার প্রথম দাতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি ওই তহবিলে পঞ্চাশ টাকা দান করেন। ১৯০৫ সালে স্বামী সারদানন্দ ওই তহবিলে কে. পি. ঘোষের কাছ থেকে একশো টাকার একটি চেক গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ক্ষুদিরামের বসতবাটী ও যুগীশিবের মন্দির

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণের জন্য মূল যে-কাজ—ঠাকুরের স্মৃতিপূত অংশের জমিটি মঠ-মিশনের অধীনে আনা—সেটি শ্রীশ্রীমায়ের হস্তক্ষেপ ও দূরদর্শিতার জন্যই সম্ভব হয়। স্বামী ঈশানানন্দজীর স্মৃতিকথাতে আছে : একদিন এন্টালিতে উৎসব দেখতে যাওয়ার পথে রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদার কন্যা কৃষ্ণময়ী দক্ষিণেশ্বর থেকে মায়ের বাড়িতে আসেন। রামলালদাদা উপরে মাকে দর্শন ও প্রণাম করে নিচে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং 'উপরে মা ও অন্যান্য সকলের অনুরোধে মায়ের ঘরে বসিয়া লক্ষ্মীদি' দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেভাবে তিনি গান করতেন, সেইভাবে চাপা গলায় কীর্তন গেয়ে শোনাতে লাগলেন। তখনই কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান, মন্দির ও বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কথা ওঠে। লক্ষ্মীদি প্রশ্ন করেছিলেন : ''ওখানে (ঠাকুরের জন্মস্থানে) মন্দিরটি হলে আমাদের হেপাজতেই থাকবে তো? এদের (অর্থাৎ রামলালদাদা প্রমুখের) ছেলেপুলেরাই সব পূজাদি করবে?'' মা লক্ষ্মীদিকে বুঝিয়ে বলেন, সেটা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানের উপর যে মন্দির তৈরি হবে তার মালিক হবেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। তাঁরাই রামলালদাদা প্রমুখের জন্য পৃথক বাড়ি করে দেবেন এবং রঘুবীর ও শীতলার মন্দিরও পাকা করে দেবেন। এই আলোচনার পর ''শরৎ মহারাজের সহিত রামলালদা উপরে মহারাজের ঘরে আসিলে লক্ষ্মীদি তাঁহাদের নিকট গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঐ সকল প্রস্তাব বিস্তারিত বলিলেন। রামলালদাও একটু হাসিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। মহারাজও সকল কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।'' এইভাবে, ঠাকুরের বংশধরদের সঙ্গে বহুবার বহু আলোচনার ফলে হয়তো যে-মীমাংসায় আসা সম্ভব হত, কিংবা কোনও মীমাংসায় হয়তো আসা যেত না—মা তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতাবলে অনায়াসে সেটি সম্ভব করে দিলেন। এর কিছু পরে ঠাকুরের বসতবাড়ির ''ভিতরে দেড় কাঠা পরিমিত জন্মস্থানটি ১৩২৫ সালে (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই) শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানে স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য রামলালদা, শিবুদা, লক্ষ্মীদি ও শ্রীশ্রীমা বেলুড় মঠের ট্রাস্টীগণকে অর্পণনামা

সম্পাদন করিয়া দেন।”

এরও কিছু আগে, মায়েরই পরামর্শে—সারদানন্দজী ঠাকুরের ভিটেবাড়ি সংলগ্ন পনেরো কাঠা জমি লাহাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। তাঁকে এই ব্যাপারে সহায়তা করে চলেছিলেন কোয়ালপাড়ার স্বামী কেশবানন্দ (কেদার মহারাজ), শ্যামবাজারের প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী ঈশানানন্দ। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর স্মৃতিকথা অনুযায়ী এই জমিখণ্ডের পরিমাণ ছিল পনেরো কাঠা, দাম দিতে হয়েছিল তিনশো কুড়ি টাকা। ‘সুখলাল গোস্বামীর ডাঙা জমি’ নামে ওই জমি পরিচিত ছিল। স্বামী ঈশানানন্দজীর মতে, এই জমিটি ঠাকুরের পৈতৃক বসতবাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল, পরিমাণ ছিল ষোলো কাঠার মতো; সেটি ‘‘শরৎ মহারাজ চারশত টাকা মূল্যে ও বাৎসরিক চারি আনা খাজনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও আশ্রমবাটীর জন্য বহু চেষ্টায় খরিদ করিয়াছিলেন।” আগাছা, কাঁটাগাছ ও একটি বিশাল গর্ত-সম্বলিত ওই জমিটিকে মাটি ঢেলে ভরাট ও পরিষ্কার করেন গৌরীশ্বরানন্দজী। তাঁর স্মৃতিকথা অনুযায়ী ওই জমির উপরেই কামারপুকুরের বর্তমান মন্দিরের নাটমন্দিরটি অবস্থিত এবং বাকি জমি নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের বর্তমান খোলা অংশ।

ঠাকুরের জন্মস্থানের দেড়কাঠা মাপের জমিটি মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করে দেওয়ার ঠিক দু-বছর পরে শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটে। এরপর পরপর প্রয়াত হন ১৯২২-এ রাজা মহারাজ, ১৯২৭-এ স্বামী সারদানন্দ। এর পরের কয়েক বছর মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষের অধিকাংশ মনোযোগ ও শক্তি নিবদ্ধ থাকে অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যেগুলির মধ্যে প্রধান হল বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষ পালন এবং বিজ্ঞানানন্দজীর তত্ত্বাবধানে বেলুড় মঠে যে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার রূপায়ণ। কিন্তু উভয় ঘটনার পূর্বেই মঠ-মিশনে আবারও মহা আঘাত আসে দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজের মহাপ্রয়াণে (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে)। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন যখন একবছর ধরে চলছে, তখন দেহত্যাগ করলেন তৃতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে) এবং বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উদ্বোধনের অব্যবহিত পরেই দেহত্যাগ করলেন চতুর্থ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে)। পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দও প্রয়াত হলেন ওই ১৯৩৮ সালেই কয়েক মাস পরে। ষষ্ঠ সঙ্ঘাধ্যক্ষের পদে বিরাজিত হলেন স্বামী বিরজানন্দ।

এইসব ঘটনাপরম্পরায় ঠাকুরের জন্মস্থানে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্বিত হলেও মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ আবার সেদিকে নজর দিলেন। ঠাকুরের জন্মভিটার জমিটি বেলুড় মঠকে অর্পণ করার সময় রামলালদাদা প্রমুখ শ্রীশ্রীমায়ের যে-ব্যবস্থাপনায় সম্মত হয়েছিলেন তা হল : যখনই বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁদের জন্য বিকল্প বাসস্থান তৈরি করে দিতে অথবা তাঁদের এমন উপযুক্ত অর্থ দিতে সমর্থ হবেন যার দ্বারা তাঁরা নিজেরাই অন্যত্র বাসগৃহ তৈরি করে নিতে সক্ষম হবেন—তখনই তাঁরা তাঁদের কুটিরগুলি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে লক্ষ্মীদিদি ও রামলালদাদা উভয়েই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের উত্তরসূরিরা, প্রধানত শিবরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পার্বতীচরণ এ-ব্যাপারে বাধা দিতে থাকেন। স্থানীয় জমিদার লাহা পরিবারকে প্রয়োজনীয় খাজনা প্রদান করে তিনি ঠাকুরের জন্মভিটায় বসবাস করতে থাকেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, ‘‘এইভাবে যখন পূর্ব প্রজন্মের করা চুক্তি ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন সন্ন্যাসীরা ভয় পেতে শুরু করলেন যে, জন্মভিটার বর্তমান মালিকেরা হয়তো অর্থের বিনিময়ে জমি ও কুটিরগুলি অন্য কাউকে বিক্রি করে দেবেন। তখন তাঁরা সরকারের দ্বারস্থ হয়ে তাঁদের অনুরোধ

শ্রীরঘুবীরের মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাসকক্ষ : প্রাচীন চিত্র

করলেন, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তাঁরা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটাটি অধিগ্রহণ করেন, যাতে সেই স্থানটিকে একটি জাতীয় সৌধ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়।

''মঠ-মিশনের এই সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নয়, তার প্রমাণ কাশীপুর উদ্যানবাটীর ঘটনা। যখন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সরকারের মাধ্যমে উদ্যানবাটী অধিগ্রহণের চেষ্টা করছেন, তখন একদল লোক তার আভাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুর উদ্যানবাটী কিনে নেয়, যার ফলে মিশনকে পরে অনেক অর্থের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে উদ্যানবাটী কিনতে হয়। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, সেই একই লোকেরা গোপনে কামারপুকুরের ব্যাপারেও অনুরূপ প্রয়াস চালাচ্ছে। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মঠ-মিশনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান, তাঁর ও তাঁর পিতৃপরিবারের আবাসগৃহ এবং তৎসংলগ্ন কিছু জমি অধিগ্রহণ করলেন এবং ঠিক পরের মাসেই (এপ্রিল ১৯৪৭) কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন উভয়েরই কেন্দ্র স্থাপিত হল। সম্পত্তির মালিকরা বাজারের চলতি দাম অনুযায়ী অর্থ পেলেন, আবার সঙ্গে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ('The owners of the property received its market price plus the usual compensation)। তাছাড়াও ওই পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ আরও অতিরিক্ত অর্থ তাঁদের দিলেন এবং পারিবারিক দেবতা রঘুবীরের কুটিরটি ইট ও কংক্রিট দিয়ে নতুন করে তৈরি করে দিলেন।''[১] সরকার যে-পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করে মঠ-মিশনকে দিয়েছিলেন তার পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ বিঘা।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় জমি ও বাসকক্ষগুলি রামকৃষ্ণ মঠের জন্য অধিগৃহীত হলেও পার্বতীচরণের অসহযোগিতার জন্য বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা অনেকদিন সেখানে প্রবেশ করতে পারেননি। পার্বতীচরণ নিজে সপরিবার দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে থাকলেও একজন তত্ত্বাবধায়ককে (care taker) ঠাকুরের জন্মভিটায় রেখে দিয়েছিলেন নিজের দখল বজায় রাখতে। অবশেষে আরামবাগের তৎকালীন মহকুমা শাসক একদিন নিজে পুলিশ সহ ঠাকুরের জন্মভিটায় এসে উপস্থিত হন এবং ওই তত্ত্বাবধায়কের উপস্থিতিতে বাড়ি আর জমির অধিকার রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের হাতে অর্পণ করেন।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মস্থানের উপরে একটি মন্দির নির্মাণের বিষয়ে মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। অছি পরিষদের (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর) ১৮ জুন ১৯৪৮-এর মিটিংয়ে এ-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এবং স্থির হয়, মন্দির নির্মাণের সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্দির চুনার পাথরে নির্মিত হবে বলে আগেই ঠিক হয়েছিল। এই মিটিংয়ে 'মেসার্স ঠাকুর অ্যান্ড কোম্পানি, চুনার' নামক কোম্পানির ১১ জুন ১৯৪৮ তারিখের প্রস্তাবটি আলোচনা করে ওই কোম্পানিকেই চুনার পাথরের অর্ডার দেওয়া হবে বলে স্থির হয় এবং সেই বাবদ ওই কোম্পানিকে

পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া অনুমোদিত হয়। এছাড়া শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণের প্রেক্ষিতে ইঞ্জিনিয়ার জি. কে. সরকার যে-পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওই সভায় সেটি গৃহীত হয়।

মন্দির নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে উদ্বোধন পত্রিকায় এই সময় দুটি আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি, কার্তিক ১৩৫৫-এর সংখ্যায়। ইংরেজি সাল ১৯৪৮, আনুমানিক মাস অক্টোবর-নভেম্বর। আবেদনপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজীর নামে। তাতে জানানো হয়েছিল : শ্রীরামকৃষ্ণের পৈতৃক বাসভবনের সংরক্ষণ এবং জন্মস্থানটির উপর একটি স্মৃতিমন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসভবন সহ ৪৫ বিঘা জমি সংগ্রহ করেছেন। চুনার পাথরের একটি ছোট মন্দির করার জন্য নকশা প্রস্তুত হয়েছে এবং তার আনুমানিক খরচ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। তার মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। মন্দির ছাড়াও ওই কেন্দ্রে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি বিদ্যালয় এবং একটি অতিথি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে এবং তার জন্য আরও পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। অর্থাৎ মন্দির সহ উপর্যুক্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন।

ওই আবেদনে আরও লিখিত ছিল : ‘‘বর্ষার পরেই (মন্দিরের) কাজ শুরু হইবে।’’ কিন্তু বাস্তবে কাজ শুরু করতে করতে পরের বছর (১৯৪৯) হয়ে যায়। সেবছর ঠাকুরের তিথিপূজা পড়েছিল ১ মার্চ ১৯৪৯। অছি পরিষদের ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখের মিটিংয়ে ঠিক হয়, ওইদিনই কামারপুকুর মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে এবং তা করবেন সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শঙ্করানন্দজী মহারাজ। সেই অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথির দিন, ১ মার্চ ১৯৪৯, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। তারপরেই মন্দির নির্মাণকাজের সূচনা হল। বর্ষা পর্যন্ত কাজ নিশ্চয়ই অতি দ্রুততায় এগিয়ে চলেছিল, কারণ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রায় সাত মাস পরেই উদ্বোধন পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৬ সংখ্যায় (ইংরেজি সাল ১৯৪৯, মাস সেপ্টেম্বর-অক্টোবর), পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর নামে মন্দিরের জন্য যে-আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল : মন্দিরের কাজ অর্ধেকেরও বেশি হয়ে গেছে। আবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি : ‘‘যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় ছোট একটি মন্দির নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। পল্লীগ্রামের পরিবেশ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পৈত্রিক বাসগৃহের কুটিরগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়াছেন। মন্দিরের কার্য অর্ধেক সমাপ্ত হওয়ার পর বর্ষার দরুন সম্প্রতি বন্ধ রহিয়াছে; বর্ষার পর পুনরায় উহা আরম্ভ করা হইবে। এ পর্যন্ত নির্মাণ কার্যে কিঞ্চিদ্ অধিক চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। মন্দিরটি সমাপ্ত করিতে আরও চল্লিশ হাজার টাকা প্রয়োজন।’’

শেষপর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ সহ মন্দিরটির খরচ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় একলক্ষ টাকা। অধিকাংশ অর্থই দেন হাওড়ার শিবপুর নিবাসী বরেণ্য ভক্ত ও ব্যবসায়ী কিরণচন্দ্র সিংহ—যিনি ‘হাওড়া মটর অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড এজেন্সী’ নামে একটি কোম্পানির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের সূচনাপর্বে কিরণচন্দ্র সিংহের অর্থ ও শ্রমদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজীর স্মৃতিচারণায় এ-সম্পর্কে আমরা কিছু নতুন তথ্য পাই : ‘‘ভক্তদের মধ্যে ‘Howrah Motor Accessories’-এর মালিক কিরণচন্দ্র সিংহ সর্বপ্রথম কামারপুকুরে কিছুটা জমি কিনে বাড়ি

করেন। একতলা টিনের ছাউনি, দুটি ঘর, সামনে চওড়া বারান্দা, তিনদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের বাইরে এক পাশে একটি ছোট পুকুর। তার তিন পাড়ে ছোটখাট kitchen garden. আমরা কামারপুকুরে গেলে ঐ বাড়িতেই থাকতাম। কিরণচন্দ্র সিংহ সাধুদের জন্য ঐ বাড়ি করেছিলেন—নিজেরা খুব কমই থাকতেন।... সেই বাড়িতে থেকে ওখানকার কাজ, আশ্রমের বাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি চলত।”

১৯৪৯ সালে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেই শঙ্করানন্দজী মঠে ফিরে গিয়েছিলেন। বেলুড় মঠের বাৎসরিক উৎসবের পরই তিনি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন কামারপুকুরের মন্দিরটির প্রতিষ্ঠায়। সম্ভবত, সঙ্ঘাধ্যক্ষ বিরজানন্দজী মহারাজের অনিশ্চিত শারীরিক অবস্থার কারণেই তিনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মন্দিরটির নির্মাণ সমাপ্ত করার জন্য। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে আসে। বাকি থাকে শুধু শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দির উদ্বোধন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মক্ষেত্রে মন্দির উদ্বোধন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষের দ্বারা হলেই সবদিক থেকে উপযুক্ত হত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সঙ্ঘাধ্যক্ষ বিরজানন্দজী গুরুতর অসুস্থ হয়ে বেলুড় মঠে তাঁর নিজের ঘরটিতেই আবদ্ধ। সেইজন্য বেলুড় মঠের অছি পরিষদের ১৭ এপ্রিল ১৯৫১ তারিখের মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় : সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন, তিনি কোনও কারণে অপারগ হলে অপর সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সেটি সম্পন্ন করবেন।

মন্দির উদ্বোধনের দিন স্থির হল ১১ মে ১৯৫১—শঙ্কর পঞ্চমী; শঙ্করাচার্য ও রামানুজাচার্যের পুণ্য জন্মতিথিতে। ওদিকে সারা ভারতজুড়ে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের আনন্দ অনুভব করার মতো আরও এক মহান কারণ ঘটেছে। ১০২৫ সালে গজনীর সুলতান মামুদ যে-সোমনাথ শিবমন্দিরকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল, সেই মন্দির আবার নির্মিত হয়েছে; নবনির্মিত মন্দিরে নয়শো পঁচিশ বছর পরে পুনঃঅধিষ্ঠিত হবেন সোমনাথ-শিবজী ওই ১১ মে ১৯৫১ তারিখেই। ‘বেদান্ত কেশরী’ তাই ওই তারিখটিকে বর্ণনা করেছিলেন ভারতের ‘নতুন মে দিবস’ বলে।

কামারপুকুর যাত্রার আগে উভয় সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ এলেন পূজ্যপাদ বিরজানন্দজীর কাছে। উত্থানশক্তি-রহিত সঙ্ঘাধ্যক্ষ তাঁর উত্তরসূরির হাতে ঠাকুরের পূত দেহাবশেষ-রক্ষিত ‘আত্মারামের কৌটো’ তুলে দিলেন। তাঁরা উভয়ে আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেলে বিরজানন্দজী তাঁর সেবককে বললেন, “দেখ, উৎসব পর্যন্ত শরীর থাকে কী না।”

উদ্বোধনের একমাস আগেই বেলুড় মঠ থেকে একদল সন্ন্যাসীকে কামারপুকুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে যা কিছু প্রাক্‌প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা সম্পন্ন করে রাখার জন্য। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নির্বাচিত ভক্ত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। সারা ভারত থেকে সাধু-ব্রহ্মচারী সহ প্রায় এক হাজার অতিথির এই উপলক্ষ্যে আসার কথা। এই অনুমান সম্পূর্ণ সঠিক ছিল—কারণ প্রকৃতই দুশো সাধু-ব্রহ্মচারী ও আটশো ভক্ত আবাসিকরূপে তিনদিনের এই মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের থাকার জন্য বারোটি বিশাল খড়ের ছাউনি করা হয়েছিল, যার প্রতিটিতে একশো বা তার বেশি লোক থাকতে পারে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ছাউনি করা হয়েছিল। পানীয় জলের জন্য জেলা বোর্ড ও জনস্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতায় বেশ কয়েকটি নলকূপ বসানো হয়েছিল। প্রতিটি ছাউনিতে বেশ কয়েকটি লণ্ঠন

রাখা হয়েছিল। এছাড়াও যাতায়াতের পথগুলিতে পেট্রোম্যাক্সের আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মন্দিরের সামনের বিশাল প্রাঙ্গণটি ও প্রধান পথগুলি আরামবাগ শহর থেকে আনা একটি ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত করা হয়েছিল। জীবনে প্রথমবার বিদ্যুতের আলো দেখে গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। অবশ্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিই তাদের কাছে ছিল পরম বিস্ময়ের—যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্যে তাদের এতদিনের দুর্গম অনুন্নত গ্রামটি রাতারাতি শহর হয়ে উঠেছে।

শুধু গ্রামবাসীই নয়, ছাউনি দেওয়া বিশাল সভামণ্ডপ, প্রসাদের বিশাল জায়গা, সুদৃশ্য পূজা ও যজ্ঞস্থল—বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সাধু ও ভক্তমণ্ডলীকেও বিস্মিত করছিল। বারবার তাঁরা সম্ভবত কুর্নিশ জানাচ্ছিলেন সেই সাধু ও স্বেচ্ছাসেবক-মণ্ডলীকে যারা একমাস ধরে পরিশ্রম করে গেছেন গোটা আয়োজনটিকে নিখুঁত করে তোলার জন্য। সভামণ্ডপে তিন হাজার নরনারীর বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং প্রসাদের ছাউনিতে একসঙ্গে একহাজার লোকের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। পাঠ, বক্তৃতা, ভজন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান যাতে বিশাল ভক্তবৃন্দ ও গ্রামবাসীর কর্ণগোচর হয়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় একটি প্রচার-গাড়ি থেকে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে এইরকম বহু লোকের সমাগম হয় সেখানে সাধারণত সংক্রামক ব্যাধি, আকস্মিক অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে। এই দিকটি দেখার জন্য সাধুরা যোগাযোগ করেছিলেন জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে—যাঁরা উৎসবক্ষেত্রে ছ-টি শয্যার একটি সাময়িক হাসপাতাল খুলেছিলেন। ভক্তদের আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে বিশেষ বাসেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর থেকে কামারপুকুর পর্যন্ত এবং তার আগে রাস্তাগুলিও মেরামত করে নেওয়া হয়েছিল বাঁকুড়া ও হুগলি জেলা বোর্ডের সহায়তায়, যানবাহন ও মানুষের চলাচলের জন্য। বাঁকুড়া থেকে কামারপুকুরের দূরত্ব তিপ্পান্ন মাইল আর বিষ্ণুপুর থেকে একত্রিশ মাইল।

অবশেষে ১০ মে সকাল থেকে তিনদিনব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হল। তার আগেই সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ-দ্বয় ও অন্যান্য বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা কামারপুকুরে পৌঁছে গেছেন। অন্যান্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দও হয় পৌঁছে গেছেন, নয়তো এসে পৌঁছচ্ছেন। মাত্র দুদিন আগেই, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার বার্ষিক অনুষ্ঠান থাকায়, কিছু ভক্ত আগে থেকেই জয়রামবাটী এসে উঠেছিলেন এবং তাঁরা ৯ মে সন্ধ্যা থেকেই কামারপুকুরে এসে পৌঁছেছিলেন। এবার একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসীর বিবরণ থেকে সেদিনের আনন্দঘন, ভাবগম্ভীর বাতাবরণের কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

‘‘শান্তির শ্রীনিকেতন শ্রীরামকৃষ্ণের পৈতৃক ভিটা। কিন্তু সে স্থানটি আজ চেনা দুষ্কর। অতি মনোরম এক মন্দির—সেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে সেই ঢেঁকিশালটির উপর, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।...’’

‘‘মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে পূজা-অনুষ্ঠান। বিরাট পূজাপর্ব। তিনদিন ব্যাপী পূজা। প্রতিষ্ঠার আগের দিন সন্ধ্যায় হল অধিবাস। তারপর যাগযজ্ঞ হল—রুদ্রযাগ, সপ্তশতী হোম, কালীপূজা, গভীর নিশীথে দশমহাবিদ্যার পূজা প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠানে পূজামণ্ডপ দিবারাত্র মুখর হল। পূজামণ্ডপটি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, মঙ্গলঘট, বিরাট হোমকুণ্ড, মণ্ডপের উপরের নানা রঙের পতাকা প্রভৃতিতে একটি অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিশিষ্ট পূজকেরা এসেছেন ব্রতী হয়ে, এসেছেন কাশীধাম থেকে দক্ষ পুরোহিতেরা—তাঁদের ছন্দোবদ্ধ শুদ্ধ

সংস্কৃত উচ্চারণে প্রাচীনকালের সামগান মুখরিত আশ্রমপ্রাঙ্গণের কথা কারু মনে পড়েছিল।...”

১০ মে রাত্রিবেলাতেই উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, ‘‘পরের দিন মঙ্গল উষায় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। রাত পোয়াতেই সকলেই প্রস্তুত সেই শুভক্ষণটির জন্য। মন্দির প্রদক্ষিণ করে [করতে?] একটি শোভাযাত্রা বেরুল, সন্ন্যাসীরা রয়েছেন পুরোভাগে, গান আরম্ভ হোল, ‘এসেছে আজ নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।’ ঐ নতুন মানুষটিরই মর্মর বিগ্রহ রয়েছেন মন্দিরের ভেতরে।” মন্দির প্রদক্ষিণ আরম্ভ হল, পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দী নিয়েছেন আত্মারামকে, বিশুদ্ধানন্দজীর মাথায় রয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি, যতীশ্বরানন্দজী নিয়েছেন শ্রীশ্রীমাকে, আর আত্মপ্রকাশানন্দজীকে দেখা যাচ্ছে স্বামীজীর ছবি মাথায় নিতে। গানের সহযোগে মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করা হল। এরপর গর্ভমন্দিরের দ্বার খুলে গেল—জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়, জয় মহামায়ী কী জয়, জয় স্বামীজী মহারাজ কী জয় প্রভৃতি জয়ধ্বনি সহ মহারাজরা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষের শ্রীহস্ত থেকে প্রাপ্ত ‘আত্মারামের কৌটা’ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ তাঁরই প্রতিনিধিস্বরূপ মন্দির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করলেন। ‘‘শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ছবি রাখা হল মন্দিরের সামনে পূজামণ্ডপে।”[২]

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রাচীন চিত্র

শিল্প-বোদ্ধা আর এক প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসী বর্ণনা করেছেন মন্দির ও বিগ্রহের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যগুলি :

‘‘সরলরৈখিক এবং কৌণিকভাবে এটি একটি অনন্যসুন্দর স্থাপত্যকীর্তি। এটি অতীতের অনুকরণমাত্র নয় বা একটি স্থাবর ধারণাও নয়। এটি একটি মৌলিক কীর্তি, যা সম্ভবত ভারতীয় স্থাপত্যের ধরনে একটি নতুন গতিশীলতার সূচনা। মন্দিরটির সৌন্দর্য প্রধানত তার সরলতা এবং আলঙ্কারিক অনাড়ম্বরতার মধ্যে নিহিত। শিবলিঙ্গের আকৃতিতে গঠিত চূড়াটি অসাধারণ অভিব্যক্তিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের ঠিক পূর্বে যুগী শিবের থেকে উদ্ভূত উজ্জ্বল আভা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রাদেবীর শরীরে লীন হয়ে যায়, যা ঐশ্বরিক সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের ইঙ্গিত দিয়েছিল, মন্দির চূড়ায় প্রতীকীভাবে তাঁকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্দিরটি ধূসর চুনার পাথরে নির্মিত, যা মন্দিরটিকে এক শান্ত মর্যাদা দিয়েছে এবং তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের পৈতৃক বাড়ির মাটির কুটির এবং কামারপুকুরের গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। রঘুবীরের জন্য একটি ছোট মন্দিরও তৈরি করা হয়েছে। এই মন্দিরটিও অত্যন্ত মনোরম এবং পরিবেশের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।... শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের অভ্যন্তরে মনোমুগ্ধকর স্তম্ভ এবং সুন্দর কাঠের আচ্ছাদন সম্বলিত একটি মার্বেল বেদী নির্মিত হয়েছে। উক্ত বেদীর সামনের দিকে একটি ঢেঁকি, একটি উনুন এবং একটি বাতিস্তম্ভের উপরে রাখা প্রদীপের ছবি খোদাই করা রয়েছে। পরিবারের ধান ভানার ঢেঁকিটি যে-ছোট চালাঘরে রাখা থাকত, সেই চালাঘরটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই শিল্প-প্রয়াস; কারণ

মাটির সেই চালাঘরটিরই এক কোণে শিশু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। বেদীতে স্থাপিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর মার্বেল মূর্তি। মূর্তিটি প্রায় দুই ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চ এবং দেখতে জীবন্ত। মূর্তিটির নির্মাতা কুমারটুলির বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর শ্রীমণি পাল।”[৩]

মন্দির ও বিগ্রহের উদ্বোধনের পর সন্ন্যাসী ও ভক্তদের এক বিরাট শোভাযাত্রা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে কামারপুকুর থেকে রওনা হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ক্রীড়াক্ষেত্র মাণিকরাজার আম্রকাননের দিকে এগোতে থাকে। অপর-দিকে জয়রামবাটী থেকেও এক বিরাট শোভাযাত্রা ঠাকুর ও মায়ের প্রতিকৃতি সহ কামারপুকুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বহু সাধু, ভক্ত নরনারী, গায়কের দল, লাঠি ও মাদলসহ নৃত্যরত অসংখ্য সাঁওতাল তাতে যোগদান করে। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি বহন করে আনছিলেন মহিলারা। উভয় শোভাযাত্রা মাণিকরাজার আমবাগানে মিলিত হলে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এরপর সম্মিলিত শোভাযাত্রাটি কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত প্রতিটি স্থান প্রদক্ষিণ করতে থাকে। অবশেষে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, শ্রীরঘুবীরের মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহ প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রা শেষ হয়। শোভাযাত্রাটির সমগ্র যাত্রাপথে সর্বক্ষণ অগণিত গ্রামবাসী দুপাশে ভক্তিবিগলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিয়েছিল।[৪]

১১ মে-র অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এসেছিলেন প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ। প্রসাদ বিতরণ চলেছিল দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এবং প্রায় সাড়ে সাত হাজার মানুষ আনন্দ ও ভক্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। মাইক্রোফোনে ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে সারাদিন বিভিন্ন ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ও স্বামীজীর গ্রন্থাবলী থেকে পাঠ এবং ভজন, সংগীত প্রভৃতি চলছিল। সংগীতের মধ্যে কোয়েম্বাতোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিবেশিত দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীত শ্রোতাদের বিশেষ ভাল লেগেছিল। ‘ভূতির খাল’-এর কাছে একটি মঞ্চে প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষের দল ব্যায়াম প্রদর্শন করেন এবং শ্রীবুদ্ধ বসু কেদারনাথ, বদরিনাথ ও কৈলাস-মানস যাত্রার চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১২ মে অনুষ্ঠিত হয় ‘সপ্তশতী হোম’। তিনদিনের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী যোগদান করেছিলেন।

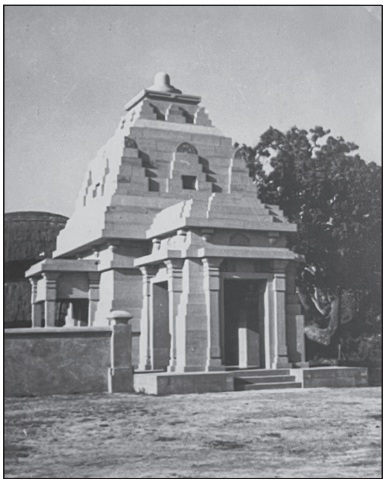

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির : প্রাচীন চিত্র

গ্রামবাংলায় যাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাই বিখ্যাত ‘হাওড়া সমাজ’কে আনা হয়েছিল যাত্রাভিনয়ের জন্য। মন্দিরের সামনের বিরাট মঞ্চে ১১ মে রাতে তাঁরা পরিবেশন করেন ‘নদের নিমাই’ এবং ১২ মে ‘নীলাচলে শ্রীচৈতন্য।’ অভিনয় ও পরিবেশনা অতীব উচ্চমানের হলেও সাধারণ গ্রামবাসীরা শহুরে শিল্পীদের নাটকীয় উৎকর্ষ অনুধাবন করতে পারে না। তারা বলতে থাকে : ‘‘রাজা নেই, মন্ত্রী নেই, ঢাল-তলোয়ার নেই, যুদ্ধ নেই—এ কোন্ দেশী যাত্রা? একে আবার যাত্রা বলে?’’

উৎসবের তিনদিন খাওয়া-দাওয়া, অনুষ্ঠান সবকিছু ঘড়ি ধরে হয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি,

এমনকী কেউ অসুস্থও হয়নি। আর, বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সময় হলেও এই তিনদিন আকাশে এক বিন্দুও মেঘ জমতে দেখা যায়নি। অবশ্যই সাধু ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাণঢালা পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রয়াস দেখে ঠাকুর-মা-স্বামীজীও সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে থেকেছেন। তাই সবকিছু সুন্দর ও পরিকল্পনামতো হয়েছে।

তিনদিনের এই অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান দেখে, বিশেষত এই সময়টুকুতে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়ায়, সরল গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তিমান ভেবেছিলেন। তাই সাধুরা যখন উৎসবের পাট চুকিয়ে ফিরে আসছেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ সাধুদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন : আপনাদের উৎসব তো হয়ে গেল; এবার দয়া করে বৃষ্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন—যাতে আমরা চাষবাস করতে পারি।

পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী গুরুতর অসুস্থ থাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠার পরদিনই, ১২ মে, শঙ্করানন্দজী বেলুড় মঠে ফিরে আসেন এবং পূজনীয় মহারাজের ঘরে গিয়ে উৎসবের সমস্ত বিবরণ দেন। উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে জেনে মহারাজের মুখে গভীর পরিতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। তাঁর জন্য শঙ্করানন্দজী ঠাকুরের পূজার যে-নির্মাল্য সঙ্গে এনেছিলেন, পরম শ্রদ্ধায় তিনি তা গ্রহণ করেন। ওই মাসেরই ৩০ তারিখে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাপদে লীন হলেন। পূজনীয় শঙ্করানন্দজী সপ্তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ-পদে বৃত হলেন ১৯ জুন ১৯৫১।

কামারপুকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে শঙ্করানন্দজী বলেছিলেন, ''মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমায় তাঁর ব্যবহৃত একখানি কাপড় ও চাদর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'অমূল্য এ দুটো কাছে রেখে দাও—পরে কাজে লাগবে।' আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ওই শুভদিনে (১১ মে ১৯৫১) মন্দির ও ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলাম ঐ কাপড় পরে, চাদর গায়ে দিয়ে। মহারাজকে উপস্থিত দেখলাম ঠাকুরঘরে—ঠাকুরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজের কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।''

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে কথামৃতকার শ্রীম-ই প্রথম কামারপুকুর দর্শন করেছিলেন। ঠাকুর তখন স্থূলশরীরে ছিলেন। শ্রীম সমগ্র কামারপুকুরকে জ্যোতির্ময় দেখেছিলেন। সে-বোধ এতটাই স্পষ্ট যে, রাস্তার একটি বিড়ালকেও জ্যোতির্ময় দেখেছিলেন এবং তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন পথের উপরেই। 'জ্যোতির জ্যোতি'-কে হৃদিকন্দরে ধারণ করে যে-কামারপুকুর চিরজ্যোতির্ময় হয়ে আছে, সেই পুণ্যক্ষেত্রকে আমাদের নিরন্তর প্রণাম। শ্রীমন্দিরের পঁচাত্তর বছর পূর্তির প্রাক্কালে তাঁকে আমাদের বিশেষ প্রণাম! ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। সম্পাদিত : স্বামী শিবপ্রদানন্দ, *হৃদয়পুর কামারপুকুর (কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিবৃত্ত)*, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, কামারপুকুর, ২০২৫

২। সম্পাদক : স্বামী সর্বদেবানন্দ, *স্বামী শঙ্করানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দের *The History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission* গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ

২। দ্রঃ *স্বামী বীতশোকানন্দের স্মৃতিচারণা*, *উদ্বোধন*, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃঃ ৩৬৪-৬৫ এবং *উদ্বোধন*, আষাঢ় ১৩৫৭

৩। স্মৃতিকথাটি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর, 'বেদান্ত কেশরী'র জুলাই ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত। অনুবাদের জন্য বহুলাংশে 'হৃদয়পুর কামারপুকুর' গ্রন্থের (পৃঃ ১৭৩-৭৪) অনুসরণ করা হয়েছে।

৪। দ্রঃ *উদ্বোধন*, আষাঢ় ১৩৫৭